শ্বেতপাথরের ঘোড়া

রতন শিকদার

আমাদের বাড়িতে একটা সেগুন কাঠের আলমারি আছে। আলমারিটা অনেকপুরোনো, বাবার আমলের। আলমারির দরজার পাল্লায় কাঁচ। সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালেই নজরে পড়ে একটা শ্বেতপাথরের ঘোড়া। আমার মনে পড়ে আমি ছোটবেলা থেকেই ওই ঘোড়াটাকে দেখে আসছি, কাঁচের ভেতর দিয়ে। ওটাকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। এখনও লাগে। ওর ওই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আমার নিজেরও কেমন বেশ বীর ভাব মনে জাগে । তবে ওর চেহারাটায় ছিল বেশ একটা শান্ত ভাব। মাঝে মাঝে আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমার মনে হত ও যদি পা(রোজ ঘোড়া হত, তবে ওর পিঠে চড়ে আমি আকাশের বুকে ঘুরে বেড়াতাম। তারপর প্রান্তরের মাঠেপাড়ি জমাতাম ওর পিঠে চড়ে। প্রান্তরের মাঠ কোথায় আমি জানি না। ভাবতাম, বড় হয়ে আমি প্রান্তরের মাঠ খুঁজে বের করব। কিন্তু পারিনি। ভাবি, পারিনি তো ভালই হয়েছে। আমার সাধের শ্বেতপাথরের ঘোড়া হয়তো প্রান্তরের মাঠে গিয়ে মুক্তি(র আনন্দে হারিয়ে যেত । হয়ত কোনদিন আর ফিরে আসত না আমাদের ওই পুরোনো আলমারির মধ্যে । আর তা যদি হত, তবে সে হত আমার প(অসহনীয়। কারণ, ওই শ্বেতপাথরের ঘোড়া আমাকে স্বপ্ন দেখায় । ওই ঘোড়া আমাকে শৈশবে নিয়ে যায়। আমাকে একাত্ম হতে সাহায্য করে, আমার মধুর অতীতের সাথে। বার্ধক্য পৌঁছেও আমার ঘোড়াটাকে দেখতে তাই দা(ণ ভালো লাগে।

আমি নাকি জন্মেছিলাম এক কুয়াশা-ঘন শীতের রাতে। মা বলতেন, 'তোকে আনতে গিয়ে আমি নিজে যেতে বসেছিলাম। মা অন্নপূর্ণার দয়াতে তুই আমি দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।' ওই অন্নপূর্ণার প্রসাদে আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল। আমাদের পাশের বাড়ির ফুলি মাসীমা অন্নপ্রাশনের দিন ওই শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ফুলি মাসীমা মাকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে যা দুরন্ত, ওই ঘোড়াটাকে আস্ত রাখলে হয়!' মা কী মনে করেছিলেন জানি না, তবে সেই আঙ্গুল প্রমাণ ঘোড়া আমাদের সামনে রাখলেই আমি নাকি শান্ত হয়ে যেতাম । এমন কী আমি কখনও কাঁদতে থাকলে, ওই ঘোড়া আমার হাতে দিলে আমি কান্না বন্ধ করে চুপটি করে ওকে নিয়ে খেলা করতাম। অন্য সময় ওই ঘোড়া আলমারিতে কাঁচের আড়ালে রেখে দিতেন মা। বাবা চাকরিসূত্রে অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে যখন এখানে এসে থিতু হলেন, তখন খাট, আলমারি, বিছানাপত্র, দামি দামি বাসন-কোসনের সাথে ওই-শ্বেতপাথরের ঘোড়াও অ(তভাবে এসে পৌঁছেছিল। আর তখন থেকেই তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গিয়েছিল ওই আলমারির কাঁচের আড়ালে ।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এখন এ বাড়ির মালিক। এ বাড়ির নাম বাবা আমাদের বংশ পরিচয়ের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য রেখেছিলেন 'রায় ভিলা' । বাড়ির ফটকে ডান দিকের পিলারে সাদা পাথরের উপর কালো হরফে সেই নাম এখনও জ্বল জ্বল করে। এ বাড়ির বয়স হল পঞ্চাশের ওপর । গেটের বাঁ দিকের পিলারে ছিল লেটার বক্সের গায়ে সাঁটা প্লাস্টিকের বোর্ডের ওপর গৃহকর্তার নাম। বাড়ির মালিক আমি হলেও বাড়ির কর্তা এখন আমার ছেলে। তাই সরিৎশেখর রায়ের নেম প্লেটটা উটে গিয়ে সে জায়গায় বসেছে অ(ণাভ রায়, অর্থাৎ বাড়ির বর্তমান কর্তার নেম প্লেট। এ বাড়িতে থেকেই বাবার চাকরি শেষ হল। আমার চাকরির শু(হল এবং সময়ের আগেই শেষ হল। মুক্ত(--বানিজ্য বাতাস অস্থির করে তুলেছিল আমার কর্মস্থল। তাই স্বেচ্ছাবসরে আমার চাকরির অবসান ঘটেছে আগেই। আমি এখন বাতিলের পর্যায়ে । তাই অ(ণাভ অর্থাৎ আমার একমাত্র সন্তানই এখন 'রায় ভিলা'র চালিকাশক্তি(। অ(ণাভের চাকরি শু(হয়েছে সে-ও বছর দশেক হল। অ(ণাভ বলেছিল, 'এই পুরোনো আমলের বাড়িতে খোল- নলচে বদলে না নিলে আর বাস করা যাবে না।' তার চাকরি পাওয়ার সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাড়ির রূপপরিবর্তন শু(হয়েছিল। পুরোনো বাড়ির নড়বড়ে কাঠামোটাকে শক্ত(পোক্ত(করতে কংক্রি(টের পিলারে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলা হয়েছিল বাড়িটাকে, ঠাকুরঘর চালান হয়ে গেল তিনতলার চিলে কোঠায় । একতলায় এক কোণে নিরিবিলিতেপড়ে থাকা ঠাকুরঘরের স্থান হল হাঁটুভাঙ্গা উচ্চতায়। পুরোনো ঠাকুর ঘরের শান বাঁধানো মেঝের বদলে ছেলে মায়ের ঘরের মেঝে বানিয়ে দিল জয়পুরের পাথর দিয়ে। দেওয়ালে লাগিয়ে দিল ঠাকুর-দেবতার ছবিওয়ালা সিরামিকের টালি। চিলে কোঠার ছোট্ট জানালায় মুখোমুখি সামনের বাড়ির উনিশ বছর বয়সি ছেলেটার সঙ্গীতচর্চার ঘর। দুই বাড়ির মধ্যে বারো ফুট চওড়া রাস্তার ব্যবধান । সকাল থেকে রাত অবধি ওই ঘরে চলে দলবল নিয়ে সঙ্গীতের মহড়া। পপ্ গানের সহযোগী কী বোর্ড, ড্রাম আর গিটার । আমার স্ত্রীর পূজার ঘরে ধ্যান করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানোর প্রাচীন অভ্যাসটা স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত(হয়।

আমার একমাত্র সন্তান অ(ণাভ তার মায়ের সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যে নিবেদিত-প্রাণ। প্রথমে গৃহসংস্কার, তারপর এক এক করে নিয়ে এল জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার সব অত্যাধুনিক সাজ - সরঞ্জাম। সাদাকালো টিভি চলে গিয়ে এল রঙীন টিভি। কাপড়কাচা মেশিন, মাইক্রো(ওভেন আরও সব জিনিস আসতেই লাগল। ছেলে মাকে বলল, 'মা, নতুন যুগের সাথে নিজেকে মানিয়ে নাও। এ সব জিনিস এখন জীবনের অঙ্গ।' আমার স্ত্রী উত্তর দিয়েছিল, 'বাবা, আমাদের তো দিন শেষ হয়েই এল। আমাদের কি এখন আর আধুনিক হওয়া সাজে? তোরা এ যুগের ছেলে, তোদের আধুনিক বৌ এসে এ সব সামলাবে।' ছেলে চুপ করে মেনে নেয়নি তার মার কথা। বলেছিল, 'কিন্তু মা, তুমিই তো আমাকে আধুনিক চিন্তাভাবনায় বড় করে তুলেছ। তোমাদের সময় যা ছিল আধুনিক, এমন তাই পুরাতন। আবার আজ যাকে তুমি বলছ আধুনিক আগামীতে তাই তো হয়ে যাবে বাতিল। তাই পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তো চলবে না।'

আমার ছেলে আধুনিকমনস্ক হলেও পুরাতন মূল্যবোধ তার হারিয়ে যায়নি। এসব কয়েক বছর আগের কথা। এরই মধ্যে আমার ছেলের আধুনিকা স্ত্রী ঘরে এসেছে। আরও কয়েক প্রস্থ তার পছন্দের নূতন নূতন জিনিস বাড়িতে এসেছে। কয়েক বছরের দুরত্বে বসে আজ মা ও ছেলের সেদিনের কথোপকথনের বিষয়ে ভাবি আস্তে আস্তে সব কেমন মেনে নিচ্ছি। অর্থের বিনিময়ে জীবনযাত্রার মান কেমন বদলে যাচ্ছে। অর্থের প্রভাবে নির্ধারিত হচ্ছে ব্যক্তি(র মান। অন্যদিকে আমার মতপূর্ণ কর্ম(ম কত লোক বেকার হয়ে যাচ্ছে। ক্র(মহ্রাসমান মূল্যের কয়েক ল(টাকা পুঁজি নিয়ে তারা একটা উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পঙ্গু হয়ে বসে থাকছে। আমার অ(ণাভ এসব অনুভব করতে পারে। সেওতো আমারই মত ওই শান্ত পুরোনো শ্বেতপাথরের ঘোড়াটাকে এখনও ভালবাসে । আমি এত অস্থিরতার মধ্যে যখন আমার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আলমারির কাঁচের পাল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখতে পাই অর্ধশতাব্দীর ওপর ধীর- স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আমার শ্বেতপাথরের ঘোড়াটাকে। আমার মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত। আমি মৌন হয়ে যাই।

আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি বোধ হয় আমার অতীতের শান্ত সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। মায়ের কথা ভীষণভাবে মনে পড়তে লাগল। মা বলতেন ওই আড়াই-তিন বছর বয়সে দৌরাত্ম্যে নাকি নিজেদের বাড়ির লোকই শুধু নয়, পাড়াপড়শিরাও সবাই অস্থির হয়ে উঠত। আমার মা তখন আমাকে বশে আনতে আমার হাতে শ্বেতপাথরের ঘোড়া তুলে দিতেন। ফুলি মাসিমার কথা মনে পড়ে গেল। ছোট্টখাটো চেহারার ফর্সা রং, সাদা শাড়িপরা শান্ত, লক্ষ্মী প্রতিমার মত মুখের গড়ন। আসলে তার দেওয়া ওই শান্ত চেহারার শ্বেতপাথরের ঘোড়াটার সাথে তার নিজের ভাব-স্বভাবকে আমি একাত্ম করে নিয়েছিলাম। আমাদের নেত্রকোণার বাড়ির সামনে একটা নদী ছিল। ফুলি মাসিমার মত এ নদীও আমাদের দাদা-দিদিদের গল্পের মধ্যে দিয়েই আমার স্মৃতিতে জেগে রয়েছে। আমার বড়দি বলত যে নদী নাকি শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই থাকত শান্ত। এ কথা আমার বি(শ্বাস করতে কেমন যেন কষ্ট হত। ভাবতাম, বর্ষার নদী আবার শান্ত হয়

নাকি ? তবে মানুষ যেমন বার্ধক্যে শান্ত হয়ে যায়, আমাদের বাড়ির সামনের নদীটাও বোধ হয় বয়সের ভারে শীর্ণ এবং শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সমগ্র পৃথিবী অশান্ত হয়ে উঠেছে তখন সেই নদী কী তেমন শান্তই রয়ে গিয়েছে ?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাই। ভাবি আমার নিজের চারপাশের পরিবেশের কথা, পরিজনের কথা. আমি আমার নিজের কথা ভাবি । আমি বরাবরই শান্ত প্রকৃতির । অফিসে, পথে ঘাটে বা হাটে-বাজারে আমার সাথে কারও কোনদিন কোন অশান্তি হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। আর এখন তো আমি গৃহবন্দি শান্ত। আমার স্ত্রী চিরকালের মত এখনও অচঞ্চলতার প্রতীক। আমরা দুজনে আমাদের সন্তান অ(াভের স্বভাবকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলাম। তবে অ(াভ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রচণ্ড গতিশীল, কিন্তু অশান্ত নয়। সে পুরাতনের সাথে নতুনের মেলবন্ধন ঘটাতেপারে খুব স্বাভাবিকভাবে। অথচ তার স্ত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত মে(র।

আমার পুত্রবধু তার ছোটবেলায় পাওয়া অলকানন্দা নামটাকে কাটছাঁট করে যুগোপযোগী করে নিয়েছে। সে চায় তার শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সমেত সবাই এ্যালি নামে ডাকুক বৌমা ডাকটা তার কাছে বড্ড সেকেলে মনে হয়। আমেরিকান কোম্পানিতে তার চাকরি । সেখানে যেমন সবাই সবার নাম ধরে সম্বোধন করে তেমনভাবে সে বাড়িতেও সবাইকে সম্বোধন করতে চায়। কিন্তু বাদ সেধেছে অ(াভ। একদিন শুনতে পেলাম অ(াভ বলছে, 'তুমি আমাকে একান্তে যা খুশি নাম ধরে ডাকতেপার। আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু বাবা-মার সামনে? কখনও না। ওসব আমেরিকান কায়দা আমি মেনে নিতেপারব না।'

অলকানন্দা অ(াভের পুরাতন মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ ল(্য করে তার আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাবার জন্য তার ছোট্ট ছেলে মেঘদীপকে মডেল হিসাবে বেছে নিয়েছিল। মেঘদীপের বয়স এখন সাড়ে তিন বছর। জন্মের পর থেকেই অলকানন্দা তাকে গড়ে তুলেছে একেবারে নিজস্ব কায়দায়। 'তোমার মা- বাবার ওই সেকেলে কালচারে আমি ওকে বেড়ে উঠতে দেব না'। অলকানন্দা মেঘদীপের তৃতীয় জন্মবার্ষিকীতে অ(াভকে এ কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিল। এ কথা শোনার পরও অ(াভ মেঘদীপকে তার দাদু-দিদিমার কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়েছিল। তার দাদু-দিদিমা অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী তাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'অ(াভ, এটা আবার তোর বাড়াবাড়ি । ওইটুকু ছেলে প্রণামের কী মানে বোঝে বলত !' অ(াভ বলেছিল 'মানে বোঝার দরকার নেই বাবা, ওর শুধু এই অভ্যাসটা গড়ে উঠুক যাতে ও নিজে থেকে প্রণম্যের কাছে মাথা নত করতেপারে।' মেঘদীপ তার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তার নাম বসানো মঙ্গেনিসের বার্থ ডে কেক্ কেটেছিল। কিন্তু আমারস্ত্রী তাকে নিজের হাতে রান্না করা পায়েস খাইয়ে আশীর্বাদও করেছিল। ওই জন্মদিনে মেঘদীপকে তার মা একটা ইলেক্ট্রনিক টয় উপহার দিয়েছিল। ওই খেলনাটা একটা রোবোট।

মেঘদীপের খেলনার কথা মনে হতেই আমার নিজের ছোটবেলায় উপহার পাওয়া সেই শ্বেতপাথরের ঘোড়াটার কথা আবার মনে এল। ওই খেলনা এখনও আমার এবং আমার ছেলে অ(াভের খুব প্রিয়। কিন্তু মেঘদীপ? তার তো এই ছোট্ট জীবনে আনেক মজার খেলনা জুটে গিয়েছে। এ সবেরই সংগ্রহকারী তার আধুনিকা মা । কত খেলনা। কোনটা কথা বলে, কোনটা আবার ড্রাম বাজায়। একবার আবার হাতের নীল বোতামটায় আঙ্গুল ছোঁয়ালেই তারহাতে ধরা বন্দুকটা থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরোতে থাকে। আর একজোড়া পুতুল আছে---একটা ছেলে আর একটা মেয়ে । বোতামে একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে পুতুল ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে আর একপাক ঘোরার পর একে অপরকে চুমা খায়। মেঘদীপের এসব খেলনা খুব পছন্দের, তবে ওই রোবোট খেলনাটা পাবার পর তার আর কিছুই পছন্দ হয় না। কিন্তু অ(াভ চায় না মেঘদীপ রোবোট খেলনা নিয়ে বেশি মেতে ওঠে। ওর বি(াস রোবোটটা মেঘদীপের মধ্যে এক নৃশংসভাবের উদয় ঘটাবে। রোবটটা একটা লাল বোতাম টিপে দিলেই সচল হয়ে যায়। তারপরেই ভিন্নগ্রহের প্রাণীর কাল্পনিক চেহারার মত আকৃতির রোবোট থপ থপ করে চলতে শু(করে। তার চলারপথে কোন বাধা পড়লে সে বাধাকে রোবোট দুহাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায়। মেঘদীপ জানে কীভাবে ওকে সচল করতে হয়। আর প্রতিবারই সে ওটাকে সচল করে দিয়ে তার সামনে কিছু একটা জিনিস বসিয়ে দেয়। তারপর রোবোট চলতে চলতে এগিয়ে গিয়ে সে জিনিসটাকে শূন্যে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর মেঘদীপ হাততালি দিয়ে তার আনন্দ প্রকাশ করে। এভাবে একবার একটা খেলনা বিড়ালছানাকে আছাড় দিয়ে বিশ্রীভাবে ভেঙে ফেলেছে রোবোটটা। আমরা অর্থাৎ আমি, আমার স্ত্রী বা আমাদের সন্তান অ(াভ, কেউই চাই না আমাদের মেঘদীপ ও খেলনাটা নিয়ে খেলা বন্ধ(ক।

এ মূহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার শ্বেতপাথরের ঘোড়ার সামনে। মনের মধ্যে একের পর এক আমার পরিবারের সব সদস্যদের কথা এবং বিভিন্ন চলমান দৃশ্যের উপস্থিতিতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অ(াভের (ষ্ট কণ্ঠে আমার সম্বিত ফিরল, 'না মেঘদীপ, না। তুমি রোবোট খেলনা নেবে না, অন্য খেলনা নাও'। তাকিয়ে দেখি মেঘদীপ তার অতিপ্রিয় রোবোটটাকে নিয়ে এক ছুটে চলে এসেছে আমার কাছে। অ(াভকে উদ্দেশ করে বললাম, 'থাক না, ওকে আমি সামলাচ্ছি। তুই তো ছোটবেলায় কথার অবাধ্য হলে তোকে আমার শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা দিয়ে বসিয়ে দিতাম আমরা । আর তুইও তখন সব কিছু ভুলে ওটা নিয়ে মেতে থাকতিস।' আমার কথার প্রতিটি শব্দ মেঘদীপ মনে হয় মন দিয়ে শুনল। আর অমনি তারও দাবি উঠল, 'দাদু, আমাকে ঘোড়াটা দাও না, আমি খেলব।' বোধহয় আমার কথাতে খানিক আস্থা পেয়েছে সে। রোবোটটাকে মেঘদীপ মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরপরই সে রোবোটের লাল বোতামটায় চাপ দেবে । আর রোবোট চলতে শু(করবে। মেঘদীপও তার সাথে সাথে হাততালি দিয়ে চলবে। অ(াভ আমাকে সতর্ক করল, 'বাবা তুমি ওকে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা দিও না। ওই দস্যি ছেলে অতদিনের প্রাচীন জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবে।'

অ(াভের কথা আমার কানে প্রবেশই করল না। আমি আলমারির দরজা খুলে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা বের করে নিলাম। তারপর মেঘদীপকে কোলে তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম ঘোড়াটা। ওটা পেয়ে মেঘদীপ আমার কোল থেকে নেমে পড়ল। ওর রোবোটটা এখন থপ থপ করে এগিয়ে চলেছে চোদ্দ ফুট লম্বা ঘরের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তের দিকে। তার সামনে ফুট ছ-সাতের মধ্যে কোন বাধা নেই। মেঘদীপ এক ছুটে এগিয়ে গিয়ে ওর চলার পথের সোজাসুজি ওই রোবোট থেকে ফুট তিনেক দুরত্বে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। যেন তিন প্রজন্মের ব্যবধানের দুই প্রতিনিধি একে অপরের সম্মুখীন। একজন স্থিতিশীল এবং অন্যজন জঙ্গম । আর মাত্র কয়েকটি মূহূর্তে, তারপরই হবে এক সংঘাত। কত তীব্র হবে সে সংঘাত সম্ভুত শক্তি(! আণবিক বোমার বিস্ফোরণ তো ধ্বংস করে দিয়েছিল এক মানব সভ্যতা । এই সংঘর্ষের তীব্রতা কি হবে তার থেকে তীব্র ?

কয়েক মূহুর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে দুই প্রজন্ম ধরে সযত্নে লালিত ভালবাসার এক নিদর্শন, নাকি কোন ঐতিহ্য, নাকি সংগোপনে সঞ্চিত কোন মূল্যবোধ ? নিকট ভবিষ্যতের গহ্বরে লুকিয়ে রয়েছে এ সব প্রশ্নের উত্তর। কয়েক মুহূর্ত পরের বিভৎস দৃশ্যটা কল্পনা করে শিহরিত হয়ে উঠছি। একী চরম একপরী(ার সম্মুখীন করলাম নিজেকে। আতঙ্কে বাধ্য হয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। এ সময় অ(াভও বোধহয় আমারই মত শঙ্কিত চিত্তে দাঁড়িয়েছিল একটু দূরত্বে। মেঘদীপকে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা দেবার আমার সিদ্ধান্তের বি(দ্ধে মত প্রকাশ করলেও আমাকে সে বাধা দেয়নি। তার মূল্যবোধ তাকে বিরত করেছে।

চোখ মেললাম। রোবোট আর শ্বেতপাথরের ঘোড়ার মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য। মুহূর্তের মধ্যে মেঘদীপ লাফিয়ে পড়ে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটাকে মেঝে থেকে তুলে নিল কোলে। আর মাত্র তিন-চার পা। তারপরই রোবোট গিয়ে ধাক্কা মারল দেওয়ালে । তার চোখ দুটোতে দপদপ করে জ্বলা নীল আলোটা নিভে গেল। রোবোটটা